আমরা বনাম তোমরা
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতি

আনোয়ার হাসান

আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার দলের লোকরা সবাই ফেরেশতা তুল্য, তোমরা অর্থাৎ তুমি ও তোমার দলের লোকরা সবাই শয়তানের ভাই; আমাদের সবকিছু একেবারে সঠিক, তোমাদের সবকিছু সম্পূর্ণ ভুল, আমরা খাঁটি দেশপ্রেমিক, তোমরা বিদেশী এজেন্ট ও ষড়যন্ত্রকারী— এই আপ্ত বাক্যগুলো আমাদের যেকোনো ধরনের দলাদলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও মনে হয় সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য রাজনৈতিক দলাদলিতে। গণতন্ত্র থাকলে দল থাকবে, দল থাকলে মতপার্থক্য থাকবে (অবশ্য দু'চারটা জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্যও তো থাকার কথা)। কিন্তু ঐ মতপার্থক্য কি এমন চরম পর্যায়ে যাওয়া উচিত যেখানে আমরা বনাম তোমরা দিয়েই সব কিছু বিচার করা হয়? দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমাদের রাজনীতির অবস্থা তাই। সমগ্র দেশের রাজনীতির পর্যালোচনা না করে, শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতির একটা মোটামুটি পর্যালোচনা করলেই এই সত্য প্রতিভাত হয়। '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপাচার্য থেকে শুরু করে ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য, সিনেট সদস্য ইত্যাদি প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পূরণ করা হয় নির্বাচনের মাধ্যমে, আর প্রতি বছরের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন তো মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর থেকেই হয়ে আসছে। প্রধানত এই সমস্ত নির্বাচনের জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও) শিক্ষকরা গ্রুপিং করেন, যাকে অনেকে দলাদলি বলে থাকেন, অনেকে আবার শিক্ষক রাজনীতিও বলেন। বর্তমানে এই রাজনীতি যে পর্যায়ে আছে তা বুঝতে হলে মোটামুটি স্বাধীনতার পর থেকে এর বিবর্তনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলেই চলে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (এবং ছাত্র ও কর্মচারী)দের অবদানের কথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। অধিকাংশ শিক্ষকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অল্পসংখ্যক কিন্তু পাকিস্তানের সমর্থক হিসেবে এর বিরোধিতা করেছেন।

এ থেকেই স্বাধীনতার পর শিক্ষকরা স্বাধীনতার পক্ষের এবং পাকিস্তানের পক্ষের (চুপিচুপি অবশ্য) এই দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এরপর বাকশাল যখন গঠন হলো তখন বাকশালে যোগদান করা এবং না করা থেকে স্বাধীনতার পক্ষের দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। পরবর্তী সময়ে নির্বাচনের প্রচারপত্রের কাগজের রং অনুযায়ী এরা যথাক্রমে নীল দল ও গোলাপি দল নামে পরিচিতি লাভ করে। আর পাকিস্তানি দলটি ফো'দল নাম গ্রহণ করে (তাঁরা এককভাবে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় তাদের নিজস্ব কোনো প্রচারপত্র বের হয়নি, যার রং থেকে তাঁদেরও হয়তো নামকরণ হতো)। মজা হচ্ছে, গোলাপি দলকে বিভিন্ন নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য স্বাধীনতার পক্ষের নীল দলটি, স্বাধীনতার বিপক্ষের ফো'দলটির (যাদেরকে রাজাকার বলে অন্যদের মতো নীল দলও ধিক্কার দেয়) সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। স্বাধীনতার পর পর ফো'দলের শিক্ষকরা মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজাকারীর জন্য খুবই অসুবিধায় ছিলেন, দুএকজন বড়ো নেতা বেশ উত্তম-মাধ্যম খেয়েছিলেন (একজনকে তো জনতা মেরে নর্দমায় ফেলে রেখেছিল) ও কয়েকজন দীর্ঘদিন আত্মগোপন করেছিলেন। শোনা যায়, ঐ আত্মগোপনকারীদের একজন ১৪ ডিসেম্বরের বুদ্ধিজীবী হত্যার একজন পরিকল্পনাকারী (তিনি কিন্তু এখন বেশ দাপটের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন এবং উপরন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্বেও নিযুক্ত আছেন)। তা যা হোক, স্বাধীনতার পর কয়েক বছর যেতে না যেতেই পাকিস্তানপন্থী শিক্ষকরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একটি বড়ো দলের আশ্রয় পেয়ে আবার মাথাচাড়া দিয়ে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে গেলো। নীল দল ফো'দলের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নির্বাচনে জিতে বেশ কয়েক বছর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত (?) থাকে। তাদের বড়ো নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের (এবং কিছু বাইরের প্রতিষ্ঠানের) বড়ো বড়ো পদ পেলেন। ছোটরাও ছোট ছোট পদ পেলেন বা পাওয়ার তালিকায় অপেক্ষমাণ থাকলেন। বাকশাল সমর্থক নীল দল '৭৫-এর পর বাকশালের গুরুত্ব কমে যাওয়াতে আবার মূল দল আওয়ামী লীগের সমর্থক হলেন এবং ইতিমধ্যে জামাত প্রকাশ্যে রাজনীতি করার অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় ফো'দলও প্রকাশ্যে জামাতের অঙ্গসংগঠন হয়ে গেলো। দুচারজন শিক্ষক যে এর ব্যতিক্রম নন তা নয়, যেমন নীল দলের সঙ্গে প্রথম থেকেই কয়েকজন কমিউনিস্টপন্থীও আছেন, আবার জামাতি না হয়েও শুধুমাত্র ধর্মভীরুতার জন্যও কিছু শিক্ষক ফো'দলের সমর্থক (অবশ্য ধর্মানুরাগী কিছু শিক্ষক অন্য দল দুটিতেও আছেন)। গোলাপি দল অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক নয়। যদিও কেউ কেউ তাঁদের বামঘেঁষা মনে করেন।

বহুদিন নী'দল ক্ষমতায় থাকাতে তাঁদের ব্যর্থতার (যেমন পদ পেতে ইচ্ছুক দলের সব সদস্যদের পদ দিতে না পারা) জন্য অল্প-স্বল্প সমর্থক ক্রমশ গোলাপি দলের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে ৮৪ সালের দিকে গোলাপি দল বিভিন্ন নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা লাভ করতে শুরু করে যা পরিপূর্ণ হয় তাঁদের দলের একজনের উপাচার্য পদ লাভের মধ্য দিয়ে। জামাতপন্থী ফো'দল তখন নী'দলকে ত্যাগ করে গো'দলে যোগদান করাটা লাভজনক হবে বলে মনে করে। অবশ্য গো'দলের সঙ্গে কোনোরকম আনুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা না করেই, তাঁরা বিভিন্ন নির্বাচনে গো'দলকে ভোট দেয় এই আশায় যে গোলাপি দল তাঁদের ডেকে নেবে (কিন্তু তাদের সেই আশা কখনো পূরণ হয়নি)। কিছুদিনের মধ্যে গোলাপি দলে ভ... ক্ষমতার জন্য, গোলাপি দলের বহু সদস্য সাদা দলে যোগদান করে। নীল দলের কিছু সদস্যও (যারা নীল দল ক্ষমতায় থাকার সময় কোনো রকম সুবিধাদি পায়নি) সাদা দলে চলে আসে। অল্প কিছুসংখ্যককে বাদ দিয়ে সাদা দলের অধিকাংশ সদস্যই বিএনপির সমর্থক হওয়ায় এই নতুন দলটি বদলে গেলে বিএনপির অঙ্গসংগঠন হয়ে পড়ে। সা'দলের ফো'দল অংশ অবশ্য আগের মতোই জামাতি থেকে যায়। '৯৬-এর 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন' আন্দোলনের সময় ফো'দল আবার নীল দলের দোস্ত হয়ে যায় (আওয়ামী লীগ জামাতের সঙ্গে জোটবাঁধার কারণে)। এখন আবার বিএনপি-জামাত (ও জাপা) জোট হওয়ায় ফো'দল, নীল দলকে ত্যাগ করে সাদা দলের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। তাই এখন নীল দল, ফো'দলকে আবার দোস্ত তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রাজাকারের দল বলছে এবং সাদা দল তাদের বলছে দোস্ত। এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলীয় ভিত্তি (অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রায় একই রূপ)।

এবার দেখা যাক দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের (অন্তত আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকরা তাই মনে করি) শিক্ষকদের দলগুলো পরস্পরের প্রতি কি ধরনের মনোভাব পোষণ করে। এই লেখার শুরুতে যে 'আমরা বনাম তোমরা'-র কথা বলেছিলাম, অল্প কয়েকজনকে বাদ দিয়ে আর বাকি সব দলভুক্ত শিক্ষকরা তেমনি মনোভাব পোষণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক হাজার শিক্ষকের মধ্যে সিরিয়াসলি দল করেন প্রায় ২৫০ জন (যার মধ্যে সবগুলো দল মিলিয়ে নেতা ও পান্ডি-নেতা হবে প্রায় ৫০ জন এবং বাকি ২০০ জনের মতো কর্মী)। দলীয় মিটিঙে মোটামুটি একটাই সুরে কথাবার্তা হয়— অন্য দলের শিক্ষকরা কতো দুষ্ট এবং তাদের দুষ্টামিতে বিশ্ববিদ্যালয় (ও দেশের) কতো যে ক্ষতি হচ্ছে তার ইয়াত্তা নেই।

এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নীল দল ক্ষমতায় (?) এবং তারা যে দলের সমর্থক অর্থাৎ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়, কাজেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে (বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন ইউজিসি, পিএসসি, ওয়াসা, বিসিএসআইআর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে) নীলদলের নেতারা নিযুক্তি পেয়েছেন এবং পেতে থাকবেন। মূলত এই কারণেই অধিকাংশ শিক্ষক গ্রুপিং করে নেতা হয়ে থাকেন।

তবে নেতা হতে হলে অবশ্যই একটি গুণ থাকতে হয়— তা হচ্ছে, কোনো রকম বিচার বিবেচনা না করে গ্রুপের প্রতিটি কাজের প্রতি অন্ধ সমর্থন এবং গ্রুপটি যে রাজনৈতিক দলের সমর্থক তাদের ভালোমন্দ প্রতিটি কাজের গুণগান করা (কেউ কেউ বলেন চাটুকারিতা) এবং অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে ধোলাই করে কথাবার্তা বলা, বিবৃতি দেওয়া ইত্যাদি। অথচ এ কথাতে তো মনে হয় কোনো ভুল নেই যে দেশের মুষ্টিমেয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির একটা বড়ো অংশই রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে। তাঁরা যদি দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারতেন, তবে এই অভাগা দেশটির অনেকখানি উপকারই তো হতো। এমন শিক্ষক যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যেমন নীল দলের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আমার এক বন্ধু ও ইতিহাস বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক— অবশ্য এজন্য তাঁরা কোনোদিন দলের বড়ো নেতা হতে পারবেন না, পান্ডি-নেতাই থেকে যাবেন এবং দল ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও কোনো পোস্ট-টোস্ট পাবেন না (নিশ্চিত করেই বলা যায়)।

আমি সাদা দল করি (মূলত আমার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের অধিকাংশই ঐদলভুক্ত বলে, আর বিশেষ কোনো কারণ নেই)। কিন্তু নিজের বিচার বিবেচনায় যা ভালো মনে হয় (ভুল তো অবশ্যই হতে পারে) তা বলে ফেলি। কখনো কখনো তা গ্রুপের মতের বিরুদ্ধে যায় এবং তার চেয়েও সিরিয়াস ব্যাপার হচ্ছে সাদা দল সমর্থিত রাজনৈতিক দলটির বিরুদ্ধেও কখনো কখনো গিয়ে থাকে। উদাহরণ দেয়া যায়— আমি গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তির প্রশংসা করি, আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির সমর্থক, আমি প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে বন্ধুত্ব কামনা করি, আমি মৌলবাদকে অসম্ভব অপছন্দ করি। কিন্তু আমি ওসমানী উদ্যানে ন্যাম-ভবন নির্মাণের ঘোরবিরোধী, পতিতালয় উচ্ছেদ ও বস্তি উচ্ছেদের নিন্দা করি, দেশের জন্য উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না-পারার জন্য সরকারের সমালোচনা করি (আগের সরকারগুলোও এ বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছে)। সর্বোপরি প্রায় সবকিছু দলীয়করণের নিন্দা করি।

আমি গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তির প্রশংসা করি, আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির সমর্থক, আমি প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে বন্ধুত্ব কামনা করি, আমি মৌলবাদকে অসম্ভব অপছন্দ করি। কিন্তু আমি ওসমানী উদ্যানে ন্যাম-ভবন নির্মাণের ঘোরবিরোধী, পতিতালয় উচ্ছেদ ও বস্তি উচ্ছেদের নিন্দা করি, দেশের জন্য উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না-পারার জন্য সরকারের সমালোচনা করি।

ড. আনোয়ার হাসান : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দৈনিক সংবাদ

AUG 31 1999